জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড কর্তৃক ২০১৩ শিক্ষাবর্ষ থেকে
পঞ্চম শ্রেণির পাঠ্যপুস্তকরূপে নির্ধারিত

হিন্দুধর্ম শিক্ষা

পঞ্চম শ্রেণি

২০২৫ শিক্ষাবর্ষের জন্য পরিমার্জিত

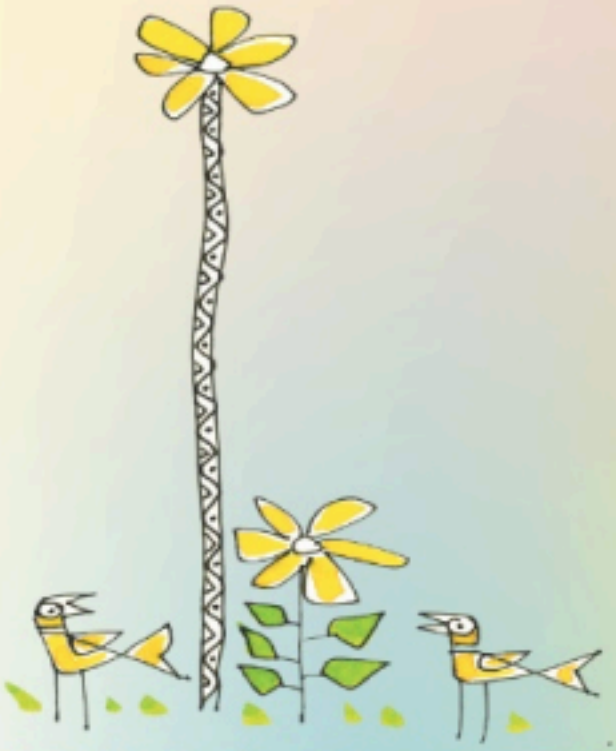

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ
৬৯-৭০, মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা - ১০০০
কর্তৃক প্রকাশিত

(প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত)

প্রথম সংস্করণ রচনা ও সম্পাদনা
প্রফেসর নিরঞ্জন অধিকারী
প্রফেসর ড. দুলাল কান্তি ভৌমিক
প্রফেসর সুনীত কুমার ভদ্র
ড. অসীম সরকার

শিল্প সম্পাদনা
হাশেম খান

ছবি ও অলংকরণ
কান্তিদেব অধিকারী

প্রথম মুদ্রণ: আগস্ট ২০১২
দ্বিতীয় মুদ্রণ: সেপ্টেম্বর ২০২৩
পরিমার্জিত সংস্করণ: অক্টোবর ২০২৪

ডিজাইন
জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীন চতুর্থ প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন কর্মসূচির আওতায় গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক বিনামূল্যে বিতরণের জন্য

মুদ্রণে:

প্রসঙ্গকথা

প্রাথমিক স্তর শিক্ষার ভিত্তিভূমি। প্রাথমিক শিক্ষা সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যমুখী ও পরিকল্পিত না হলে গোটা শিক্ষাব্যবস্থাই দুর্বল হয়ে পড়ে। এই বিষয়টি বিবেচনায় নিয়ে ২০১০ সালের শিক্ষানীতিতে প্রাথমিক স্তরকে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। বিশ্বের উন্নত দেশসমূহের সাথে সংগতি রেখে প্রাথমিক স্তরের পরিসর বৃদ্ধি এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক করার ওপর জোর দেওয়া হয়েছে। সামাজিক ও অর্থনৈতিক স্তর এবং ধর্ম-বর্ণ কিংবা লৈঙ্গিক পরিচয় কোনো শিশুর শিক্ষাগ্রহণের পথে যেন বাধা না হয়ে দাঁড়ায় এ বিষয়েও বিশেষ দৃষ্টি রাখা হয়েছে।

প্রাথমিক শিক্ষাকে যুগোপযোগী করার লক্ষ্যে জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড (এনসিটিবি) একটি সমন্বিত শিক্ষাক্রম গ্রহণ করেছে। এই শিক্ষাক্রমে একদিকে শিক্ষাবিজ্ঞান ও উন্নতবিশ্বের শিক্ষাক্রম অনুসরণ করা হয়েছে, অন্যদিকে বাংলাদেশের চিরায়ত শিখন-শেখানো মূল্যবোধকেও গ্রহণ করা হয়েছে। এর মাধ্যমে শিক্ষাকে অধিকতর জীবনমুখী ও ফলপ্রসূ করার প্রয়াস বাস্তব ভিত্তি পেয়েছে। বিশ্বায়নের বাস্তবতায় শিশুদের মনোজাগতিক অবস্থাকেও শিক্ষাক্রমে বিশেষভাবে বিবেচনায় রাখা হয়েছে।

শিক্ষাক্রম বাস্তবায়নের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উপাদান-উপকরণ হলো পাঠ্যপুস্তক। এই কথাটি মাথায় রেখে এনসিটিবি প্রাথমিক স্তরসহ প্রতিটি স্তর ও শ্রেণির পাঠ্যপুস্তক প্রণয়নে সবসময় সচেষ্ট রয়েছে। প্রতিটি পুস্তক রচনা ও সম্পাদনার ক্ষেত্রে শিক্ষাক্রমের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যকে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। শিশুমনের বিচিত্র কৌতূহল এবং ধারণক্ষমতা সম্পর্কে রাখা হয়েছে সজাগ দৃষ্টি। শিখন-শেখানো কার্যক্রম যেন একমুখী ও ক্লান্তিকর না হয়ে আনন্দের অনুষঙ্গ ওঠে সেদিকটি শিক্ষাক্রম এবং পাঠ্যপুস্তক প্রণয়নে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। আশা করা যায়, প্রতিটি বই শিশুদের সুষম মনোদৈহিক বিকাশের সহায়ক হবে। একই সাথে তাদের কাঙ্ক্ষিত দক্ষতা, অভিযোজন সক্ষমতা, দেশপ্রেম ও নৈতিক মূল্যবোধ অর্জনের পথকেও সুগম করবে।

ধর্ম শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা দিন দিন ব্যাপক হয়ে উঠছে। প্রাথমিক স্তরে এর প্রয়োজনীয়তা সবচেয়ে বেশি। কারণ এই বয়সেই একজন মানুষের ধর্মীয় ও নৈতিক ভিত্তি দৃঢ়ভাবে গঠিত হয়। এ বিষয়টি মাথায় রেখে জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০-এর আলোকে 'হিন্দুধর্ম শিক্ষা' পাঠ্যপুস্তকটি প্রণীত হয়েছে। বইটিতে ধর্মশিক্ষা দানের মাধ্যমে শিক্ষার্থীর নৈতিক গুণাবলি অর্জনের প্রতি বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।

বইটি রচনা, সম্পাদনা ও পরিমার্জনে যেসব বিশেষজ্ঞ ও শিক্ষক নিবিড়ভাবে কাজ করেছেন তাঁদের বিশেষভাবে কৃতজ্ঞতা জানাই। কৃতজ্ঞতা জানাই তাঁদের প্রতিও যাঁরা অলংকরণের মাধ্যমে বইটিকে শিশুদের জন্য চিত্তাকর্ষক করে তুলেছেন। ২০২৪ সালের পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে প্রয়োজনের নিরিখে পাঠ্যপুস্তকসমূহ পরিমার্জন করা হয়েছে। এক্ষেত্রে ২০১২ সালের শিক্ষাক্রম অনুযায়ী প্রণীত পাঠ্যপুস্তকটিকে ভিত্তি হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে। সময় স্বল্পতার কারণে কিছু ভুলত্রুটি থেকে যেতে পারে। সুধিজনের কাছ থেকে যৌক্তিক পরামর্শ ও নির্দেশনা পেলে সেগুলো গুরুত্বের সাথে বিবেচনায় নেওয়া হবে।

পরিশেষে বইটি যাদের জন্য, সেই কোমলমতি শিক্ষার্থীদের সার্বিক কল্যাণ কামনা করছি।

অক্টোবর ২০২৪

প্রফেসর ড. এ কে এম রিয়াজুল হাসান
চেয়ারম্যান
জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

সূচিপত্র

অধ্যায়	বিষয়বস্তু	পৃষ্ঠা
প্রথম অধ্যায়	ঈশ্বর ও জীবসেবা	১–৬
দ্বিতীয় অধ্যায়	ঈশ্বরের স্বরূপ এবং উপাসনা ও প্রার্থনা	
প্রথম পরিচ্ছেদ	ঈশ্বরের স্বরূপ	৭–২১
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ	উপাসনা ও প্রার্থনা	২২–৩০
তৃতীয় অধ্যায়	হিন্দুধর্মের সাধারণ পরিচয়, ধর্মগ্রন্থ এবং মহাপুরুষ ও মহীয়সী নারী	
প্রথম পরিচ্ছেদ	হিন্দুধর্মের সাধারণ পরিচয়	৩১–৩৭
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ	ধর্মগ্রন্থ	৩৮–৪২
তৃতীয় পরিচ্ছেদ	মহাপুরুষ ও মহীয়সী নারী	৪৩–৫০
চতুর্থ অধ্যায়	ঈশ্বরের একত্ব, ধর্মীয় সাম্য ও সম্প্রীতি	৫১–৫৪
পঞ্চম অধ্যায়	শিষ্টাচার ও পরমতসহিষ্ণুতা	৫৫–৬১
ষষ্ঠ অধ্যায়	অহিংসা ও পরোপকার	৬২–৬৭
সপ্তম অধ্যায়	স্বাস্থ্যরক্ষা ও যোগব্যায়াম এবং আসন	
প্রথম পরিচ্ছেদ	স্বাস্থ্যরক্ষা ও যোগব্যায়াম	৬৮–৭৩
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ	আসন	৭৪–৭৮
অষ্টম অধ্যায়	দেশপ্রেম	৭৯–৮৩
নবম অধ্যায়	ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি : পূজা-পার্বণ ও ধর্মক্ষেত্র	৮৪–৯০

প্রথম অধ্যায়

ঈশ্বর ও জীবসেবা

আমরা জানি, ঈশ্বর সর্বশক্তিমান। তিনি মানুষ, জীব-জন্তু, সাগর-নদী-পাহাড়, বৃক্ষলতা-ফুল-ফল, আকাশ-বাতাস, চন্দ্র-সূর্য-গ্রহ-তারা — সবকিছু সৃষ্টি করেছেন। ঈশ্বর স্রষ্টা— জীব ও জগৎ তাঁর সৃষ্টি।

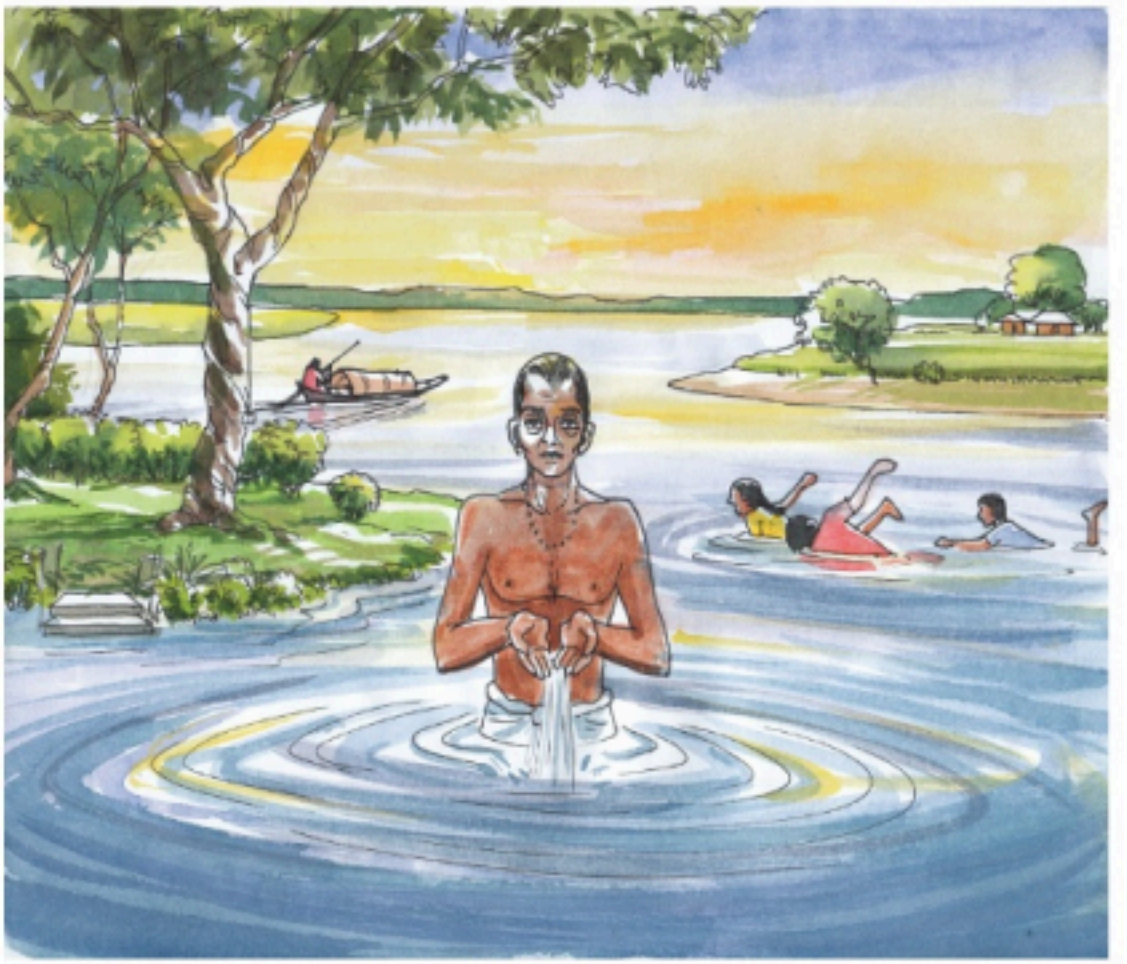

নিসর্গ দৃশ্য

ঈশ্বরের আরেক নাম পরমাত্মা। তিনি জীবের মধ্যেও অবস্থান করেন। জীবের মধ্যে অবস্থানকারী ঈশ্বরকে আত্মা বলে। ঈশ্বর জীবদেহে আত্মারূপে অবস্থান করে জীবকে পরিচালনা করেন। তাই জীবও ঈশ্বর।

২০২৫

আমরা ঈশ্বরের সেবা করে তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে চাই। জীবনে চলার পথে তাঁর করুণা লাভ করতে চাই, যাতে আমাদের মঙ্গল হয়। তাই আমরা ঈশ্বরের স্তব-স্তুতি করি। ঈশ্বরকে আমরা কাছে পেতে চাই। কিন্তু ঈশ্বর নিরাকার। তাঁকে দেখা যায় না। তাঁর শক্তি ও গুণের প্রকাশকে প্রত্যক্ষ করা যায় মাত্র।

আমরা আরেকভাবে ঈশ্বরের সেবা করতে পারি। তা হলো জীবসেবা। ঈশ্বর আত্মারূপে জীবের মধ্যে অবস্থান করেন, তাই জীবের সেবা করলে তা ঈশ্বরেরই সেবা করা হয়। এভাবে জীবসেবার মধ্য দিয়ে ঈশ্বরের সেবা করা যায়। তাই তো বলা হয়েছে — 'যত্র জীবঃ তত্র শিবঃ।' যেখানে জীব, সেখানেই শিব। এখানে শিব মানে ঈশ্বর। এ প্রসঙ্গে স্বামী বিবেকানন্দ বলেছেন,

'বহুরূপে সম্মুখে তোমার ছাড়ি কোথা খুঁজিছ ঈশ্বর।
জীবে প্রেম করে যেইজন, সেইজন সেবিছে ঈশ্বর।'

এর মর্মার্থ হলো, ঈশ্বর জীবরূপে আমাদের সম্মুখে আছেন। তাঁকে বাইরে খোঁজার দরকার নেই। যিনি জীবের সেবা করেন, তিনি জীবসেবার মধ্য দিয়ে ঈশ্বরেরই সেবা করেন।

সুতরাং জীবসেবাও ধর্ম। তাই আমরা জীবসেবার মধ্য দিয়ে ঈশ্বরের সেবা করব। আমরা দরিদ্রের সেবা করব, আমরা পীড়িত ও আর্তের সেবা করব।

আমরা পোষা জীবজন্তুর পরিচর্যা করব। গাছপালা রোপণ করব। সেগুলোর পরিচর্যা করব। এভাবে আমরা জীবকে ঈশ্বর-জ্ঞানে সেবা করব। এতে জীবের মঙ্গল হবে। জীবসেবা করে নিজেরা শান্তি পাব। ঈশ্বরও সন্তুষ্ট হবেন।

তোমার নিজের বা অন্যের জীবসেবার ঘটনা বর্ণনা কর।

এখন ধর্মগ্রন্থ মহাভারত থেকে জীবসেবার একটি উপাখ্যান শোনাচ্ছি :

দরিদ্র ব্রাহ্মণের জীবসেবা

কুরুক্ষেত্র এ উপমহাদেশের একটি পবিত্র স্থান। কুরুক্ষেত্রকে ধর্মক্ষেত্রও বলা হয়। সেই কুরুক্ষেত্রে এক দরিদ্র ব্রাহ্মণ ছিলেন। স্ত্রী, এক ছেলে ও ছেলের বউকে নিয়ে তাঁর ছোট সংসার।

কিন্তু সংসার ছোট হলে কী হবে! কোনোদিন তাদের খাওয়া জুটত, কোনোদিন আধপেটা থাকতে হতো। কোনোদিন একেবারেই না খেয়ে থাকতে হতো। কারণ ব্রাহ্মণ ধর্মসাধনা ও বিদ্যাচর্চায় সময় কাটাতেন। উঞ্ছবৃত্তি করে খাবার সংগ্রহ করতেন। উঞ্ছবৃত্তি হচ্ছে জমির ধান কেটে নেওয়ার পর জমিতে যা দু-এক ছড়া পড়ে থাকে, তা কুড়িয়ে নিয়ে তা দিয়ে খিদে মেটানো।

একক কাজ : 'উঞ্ছবৃত্তি' কথাটি বোঝাও।

একদিনের কথা।

ব্রাহ্মণ কোনো খাবার জোটাতে পারছেন না। খুবই খিদে পেয়েছে। স্ত্রী, ছেলে ও ছেলের বউও না খেয়ে আছে। পরে অতিকষ্টে কিছু যব সংগ্রহ করতে পেরেছিলেন। ব্রাহ্মণপত্নী সেই যব দিয়ে ছাতু বানালেন। তারপর সেই ছাতু চারভাগে ভাগ করলেন। চারজনে খাবেন।

জীবসেবা

ব্রাহ্মণ খেতে বসলেন।

এমন সময় সেখানে এলেন আরেক দরিদ্র ব্রাহ্মণ। তিনি জানালেন, আমরা দুর্ভিক্ষে আক্রান্ত হয়েছি। অর্ধাহারে অনাহারে দিন কাটাচ্ছি। এখন আমি খুবই ক্ষুধার্ত।

ব্রাহ্মণ অতিথি ব্রাহ্মণকে হাতমুখ ধোয়ার জল দিলেন। বসার আসন দিলেন। পানীয় জল দিলেন। ক্লান্তি দূর হলো অতিথির। তারপর ব্রাহ্মণ নিজের ভাগের ছাতু অতিথিকে পরিবেশন করলেন। অত অল্পতে পেট ভরে! ব্রাহ্মণপত্নী তাঁর নিজের ভাগের ছাতুও দিয়ে দিলেন। এভাবে অতিথি ব্রাহ্মণের খিদে মেটাতে ব্রাহ্মণের পুত্রও তার ভাগের ছাতু দিয়ে দিলেন।

তবু খিদে মিটল না অতিথি ব্রাহ্মণের।

'আর আছে?'— জিজ্ঞেস করলেন তিনি।

তখন ব্রাহ্মণের পুত্রবধূর ভাগের ছাতু অতিথির পাতে পরিবেশন করা হলো।

এভাবে ব্রাহ্মণ, তার স্ত্রী, পুত্র আর পুত্রবধূ নিজেরা ক্ষুধার্ত হয়েও জীবসেবার জন্য নিজেদের সামান্য খাদ্যও দান করলেন।

অতিথি ব্রাহ্মণ খুশি হয়ে উঠে দাঁড়ালেন।

'তোমাদের সেবায় আমি সন্তুষ্ট হয়েছি।' — বললেন অতিথি ব্রাহ্মণ। সবাই তাকালেন তাঁর দিকে।

কোথায় ব্রাহ্মণ!

এ যে স্বয়ং ধর্মদেব।

'তোমাদের পরীক্ষা করতে এসেছিলাম।' — বললেন ধর্মদেব।

জীবসেবার এই আদর্শ আমরাও যেন মনেপ্রাণে ধারণ করি।

অনুশীলনী

ক. শূন্যস্থান পূরণ কর :

১। আমরা জানি, _____ সর্বশক্তিমান।
২। ঈশ্বর সকল _____ মধ্যে আছেন।
৩। জীবের _____ করলে ঈশ্বরের সেবা করা হয়।
৪। কুরুক্ষেত্রকে _____ বলা হয়।
৫। ব্রাহ্মণ _____ আদর্শ স্থাপন করেছিলেন।

খ. ডান পাশ থেকে শব্দ এনে বাম পাশের শব্দের সঙ্গে মেলাও :

১। জীবও	ঈশ্বরের।
২। ঈশ্বর	তত্র শিবঃ।
৩। আমরা স্তব-স্তুতি করি	ছাতু।
৪। যত্র জীবঃ	মিষ্টান্ন।
৫। অতিথি খেয়েছিলেন	ঈশ্বর।
৬। প্রার্থনা করতে হয়	আত্মারূপে জীবের মধ্যে থাকেন।
	শ্রদ্ধার সঙ্গে।

গ. সঠিক উত্তরটির পাশে টিক (√) চিহ্ন দাও :

১। জীবের মধ্যে ঈশ্বর কিরূপে অবস্থান করেন?

ক. দেবতারূপে　　খ. ভ্রমররূপে
গ. মনরূপে　　ঘ. আত্মারূপে

২। 'বহুরূপে সম্মুখে তোমার ছাড়ি কোথা খুঁজিছ ঈশ্বর?' — কথাটি কে বলেছেন?

ক. রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব　　খ. স্বামী বিবেকানন্দ
গ. স্বামী লোকনাথানন্দ　　ঘ. স্বামী পূর্ণানন্দ

৩। ব্রাহ্মণ কীভাবে সংসার চালাতেন?

ক. পূজা করে খ. কীর্তন করে
গ. উঞ্ছবৃত্তি করে ঘ. ধর্মকথা শুনিয়ে

৪। অতিথি ব্রাহ্মণরূপে কে এসেছিলেন?

ক. ধর্মদেব খ. বিষ্ণু
গ. শিব ঘ. ইন্দ্র

৫। ব্রাহ্মণের পরিবারে কতজন সদস্য ছিল?

ক. একজন খ. দুজন
গ. তিনজন ঘ. চারজন

ঘ. নিচের প্রশ্নগুলোর সংক্ষেপে উত্তর দাও :

১। আত্মা বলতে কী বোঝ?
২। জীব বলতে কী বোঝ?
৩। ব্রাহ্মণের আর্থিক অবস্থা কেমন ছিল?
৪। ধর্মদেব অতিথি হয়ে এসেছিলেন কেন?
৫। আমরা কার সেবা করে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করি?

ঙ. নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

১। ঈশ্বর ও জীবের সম্পর্ক বুঝিয়ে লেখ।
২। আমরা জীবসেবা করব কেন?
৩। কীভাবে জীবের সেবা করা যায়?
৪। ব্রাহ্মণকে অতিথি ব্রাহ্মণ এসে কী বলেছিলেন?
৫। ব্রাহ্মণ ও তাঁর পরিবারের সবাই নিজেরা না খেয়ে অতিথি ব্রাহ্মণকে খাইয়েছিলেন কেন?

দ্বিতীয় অধ্যায়

ঈশ্বরের স্বরূপ এবং উপাসনা ও প্রার্থনা

প্রথম পরিচ্ছেদ

ঈশ্বরের স্বরূপ

আমরা জানি, ঈশ্বর এক ও অদ্বিতীয়। তাঁর অনন্ত শক্তি। অন্ত মানে শেষ। অনন্ত মানে যার শেষ নেই। ঈশ্বরের শক্তির শেষ নেই। তিনি সর্বশক্তিমান। আবার ঈশ্বরের অনন্ত গুণ। তাঁর গুণেরও শেষ নেই। তিনি আমাদের সৃষ্টি করেছেন। আমাদের তিনি পালন করেন। আমাদের জীবন, আমাদের মৃত্যু—সবকিছুর মূলেও তিনি। তাঁর সমান কেউ নেই।

ঈশ্বর নিরাকার। তবে তিনি যে কোনো আকার ধারণ করতে পারেন। ঈশ্বর যখন নিরাকার, তখন তাঁকে বলা হয় ব্রহ্ম। ব্রহ্ম সকল জীব ও জগতের উপর প্রভুত্ব করেন। তাই ব্রহ্মের আরেক নাম ঈশ্বর। ঈশ্বর শব্দটির মানে হচ্ছে প্রভু। এই ব্রহ্ম বা ঈশ্বর যখন আমাদের কৃপা করেন, জগতের মঙ্গল করেন, তখন তাঁকে বলা হয় ভগবান।

নিচের ছকটি পূরণ করি :

১। ঈশ্বর যখন নিরাকার তখন তাঁকে বলা হয়	
২। সবকিছুর মূলে রয়েছেন	

ব্রহ্ম সকল প্রাণের উৎসস্বরূপ। তাঁর থেকেই জগতের সৃষ্টি। তাঁর মধ্যেই জগতের অবস্থান। আবার তিনিই আত্মারূপে জীবের মধ্যে অবস্থান করেন। তাই ধর্মগ্রন্থ উপনিষদে বলা হয়েছে 'সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম' অর্থাৎ, সবকিছুই ব্রহ্ম বা ঈশ্বর। সুতরাং ব্রহ্ম, ঈশ্বর, ভগবান, দেব-দেবী এবং আত্মা — আলাদা কিছু নয়। একই ঈশ্বরের ভিন্ন-ভিন্ন নাম ও পরিচয়। জীবের মধ্যে আত্মারূপে ঈশ্বর অবস্থান করেন বলেই জীবকে ভালোবাসলে ঈশ্বরকেই ভালোবাসা হয়। তাই জীবকে ব্রহ্মজ্ঞানে সেবা করা আমাদের কর্তব্য।

ঈশ্বরের সাকার রূপ

দেব-দেবী

আমরা জানি, ঈশ্বরের কোনো আকার নেই। তিনি নিরাকার। তবে নিরাকার হলেও সর্বশক্তিমান ঈশ্বর যে কোনো আকার ধারণ করতে পারেন। তিনি যে কোনো রূপে নিজেকে প্রকাশ করতে পারেন। নিজের গুণ বা ক্ষমতাকে তিনি আকার দিতে পারেন। ঈশ্বরের কোনো গুণ বা ক্ষমতা যখন আকার বা রূপ পায়, তখন তাকে দেবতা বা দেব-দেবী বলে। দেব-দেবীর মধ্য দিয়ে ঈশ্বরেরই শক্তির প্রকাশ ঘটে। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব, দুর্গা, সরস্বতী, লক্ষ্মী, গণেশ প্রভৃতি দেব-দেবী একই ঈশ্বরের ভিন্ন ভিন্ন শক্তি বা গুণের ভিন্ন ভিন্ন রূপ। যেমন ঈশ্বর যে-রূপে সৃষ্টি করেন, তাঁর নাম ব্রহ্মা। যে-রূপে তিনি পালন করেন, তাঁর নাম বিষ্ণু। তাঁর শক্তির প্রকাশ ঘটেছে দেবী দুর্গার মধ্য দিয়ে। দেবী সরস্বতী যে-বিদ্যা দান করেন, তা ঈশ্বরেরই একটি গুণ। বেদ, পুরাণ প্রভৃতি ধর্মগ্রন্থে দেব-দেবীর রূপ, গুণ, শক্তি ও পূজা করার পদ্ধতি বর্ণনা করা হয়েছে। দেব-দেবীর পূজা করলে তাঁরা সন্তুষ্ট হন। দেব-দেবীরা সন্তুষ্ট হলে ঈশ্বর সন্তুষ্ট হন। সুতরাং দেব-দেবীর পূজার মাধ্যমে ঈশ্বরেরই পূজা করা হয়।

নিচের ছকটি পূরণ করি :

১। ঈশ্বর যে-রূপে পালন করেন তাঁর নাম	
২। দেবী সরস্বতী যে-বিদ্যা দান করেন তা	

অবতার

কখনো কখনো পৃথিবীতে খুবই খারাপ অবস্থা বিরাজ করে। অশুভ শক্তির কাছে শুভ শক্তি পরাজিত হয়। মানুষ ধর্মকে ভুলে গিয়ে অধর্মের আশ্রয় নেয়। চারদিকে দুঃখের আর্তনাদ শোনা যায়। এ অবস্থা দেখে ধার্মিক ব্যক্তিদের হৃদয় কেঁদে ওঠে। তাঁরা ঈশ্বরের নিকট দুঃখ মোচনের আকুল প্রার্থনা জানান। তখন করুণাময় ঈশ্বর জগতের কল্যাণের জন্য পৃথিবীতে অবতীর্ণ হন। তিনি অশান্তি দূর করে শান্তি প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি দুষ্কৃতিকারীদের ধ্বংস করেন, সাধু-সজ্জনদের রক্ষা করেন এবং ধর্ম প্রতিষ্ঠা করেন।

শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন —

যদা যদা হি ধর্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত।
অভ্যুত্থানমধর্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্ ॥ (৪/৭)
পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্।
ধর্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে ॥ (৪/৮)

অর্থাৎ পৃথিবীতে যখনই ধর্মের গ্লানি হয় ও অধর্ম বেড়ে যায়, তখনই আমি নিজেকে সৃষ্টি করি। সাধুদের পরিত্রাণ, দুষ্কৃতিকারীদের বিনাশ এবং ধর্ম সংস্থাপনের জন্যও আমি যুগে যুগে অবতীর্ণ হই।

পৃথিবীতে ঈশ্বরের এরূপ অবতরণকে বলে অবতার। এভাবেই ঈশ্বর অবতাররূপে এসে মানুষের এবং জগতের মঙ্গল করেন।

দশ অবতারের পরিচয়

ভগবান বিষ্ণু বিভিন্ন যুগে দশটি অবতারে নিজেকে প্রকাশ করেছেন। যেমন — মৎস্য, কূর্ম, বরাহ, নৃসিংহ, বামন, পরশুরাম, রাম, বলরাম, বুদ্ধ এবং কল্কি। লক্ষণীয়, দশ অবতারের মধ্যে শ্রীকৃষ্ণের উল্লেখ নেই। এর কারণ হচ্ছে, অন্যান্য অবতার ভগবানের অংশবিশেষ। শ্রীমদ্‌ভাগবতপুরাণে বলা হয়েছে কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ম্। অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ নিজেই ভগবান। তাই দশ অবতারের মধ্যে শ্রীকৃষ্ণের উল্লেখ নেই।

এখানে সংক্ষেপে ভগবান বিষ্ণুর দশ অবতারের পরিচয় দিচ্ছি :

১। মৎস্য অবতার

হাজার হাজার বছর আগে সত্যব্রত নামে এক ধার্মিক রাজা ছিলেন। তাঁর রাজত্বকালে হঠাৎ পৃথিবীতে নানারূপ অন্যায়-অত্যাচার দেখা দেয়। রাজা তখন জগতের কল্যাণের জন্য ঈশ্বরের করুণা কামনা করেন।

একদিন জলাশয়ে স্নানের সময় রাজা সত্যব্রতের নিকট একটি পুঁটি মাছ এসে প্রাণ ভিক্ষা চায়। রাজা কমণ্ডলুতে করে মাছটিকে বাড়ি নিয়ে এলেন। মাছটির আকার ভীষণভাবে বাড়তে থাকে। তাকে পুকুর, সরোবর, নদী, যেখানেই রাখা হয়, সেখানেই আর ধরে না। রাজা ভাবলেন, ইনি নিশ্চয়ই নারায়ণ। নারায়ণ বিষ্ণুর আরেক নাম। রাজা তখন মৎস্যরূপী নারায়ণের স্তব-স্তুতি করতে লাগলেন।

তারপর মৎস্যরূপী নারায়ণ রাজাকে বললেন, সাতদিনের মধ্যেই জগতের প্রলয় হবে। সে সময় তোমার ঘাটে এসে একটি স্বর্ণতরী ভিড়বে। তুমি বেদ, সব রকমের জীবদম্পতি, খাদ্য-শস্য ও বৃক্ষবীজ সংগ্রহ করে তাদের নিয়ে সেই নৌকায় উঠবে। আমি তখন শৃঙ্গধারী মৎস্যরূপে আবির্ভূত হবো। তুমি তোমার নৌকাটি আমার শৃঙ্গের সঙ্গে বেঁধে রাখবে।

মহাপ্রলয় শুরু হলো। রাজা মৎস্যরূপী ভগবান শ্রীবিষ্ণুর নির্দেশ মতো কাজ করলেন। ধ্বংস থেকে রক্ষা পেল তাঁর নৌকা। প্রলয় শেষে রাজা সমস্ত কিছু নিয়ে নৌকা থেকে নেমে এলেন। এভাবেই মৎস্য অবতাররূপে ভগবান শ্রীবিষ্ণু সৃষ্টিকে রক্ষা করলেন। বেদও সংরক্ষিত হলো।

মৎস্য অবতার

২। কূর্ম অবতার

পাতালবাসী অসুরেরা একবার দেবতাদের পরাজিত করে স্বর্গরাজ্য দখল করে। তখন ব্রহ্মা ও ইন্দ্র নিপীড়িত দেবতাদের সঙ্গে নিয়ে শ্রীবিষ্ণুর কাছে গেলেন। অসুরদের অত্যাচারের কথা বললেন। শ্রীবিষ্ণু দেবতাদেরকে অসুরদের সঙ্গে নিয়ে ক্ষিরোদ সমুদ্র মন্থনের পরামর্শ দিলেন। তিনি বললেন, সমুদ্র মন্থনের ফলে যে অমৃত উঠে আসবে, তা পান করে দেবতাগণ অসুরদের পরাজিত করার শক্তি ফিরে পাবেন।

কূর্ম অবতার